বণিক বার্তা
রেজি নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা, ২০২০-০৯-২৯, পৃঃ- ০৪

আলোকপাত | ড. এ. কে. এনামুল হক

কভিড-১৯, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকতা

বহুদিন ঘর থেকে বের হইনি। ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি কেমন আছে আমাদের ক্যাম্পাস। যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ১টা হবে। পরিচিত কোনো কোলাহল নেই। শিক্ষার্থীবিহীন ক্যাম্পাস দেখতে ভূতুড়েই মনে হলো। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখতে পেলাম অফিসের লোকজন এসেছে। তারা পালাক্রমে আসে। যেন একসঙ্গে ভিড় না হয়। দূরত্ব বজায় থাকে। তারাই জানাল মাঝে মাঝে শিক্ষকরাও আসেন। যে যার মতো। কাজ করে চলে যান। বুঝতে পারলাম ক্যাম্পাসের মায়া না থাকলে শিক্ষক হওয়া যায় না। তাই সবাই কোনো না কোনো ছুতায় মাঝে মাঝেই আসেন।

আমরা চারজন একটি বই লিখছি। প্রায় এক বছর হলো। চারজন চার দেশে থাকি। একজন থাকেন ওহাইওতে। সেখানে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। অন্যজন গোয়ায়। ভারতের গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। অন্যজন নেপালে। হঠাৎ করেই স্প্রিংজার নেচার বইটি প্রকাশ করতে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় আমরা প্রতি সপ্তাহে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় জুম দিয়ে কথা বলি। তাই ভাবলাম, তারাও কি ক্যাম্পাসে যায়? জিজ্ঞেস করি।

ওহাইওর অবারলিনের বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম। ক্যাম্পাসে যাও? জানাল, সেও যায়। মাঝে মাঝেই। অবারলিন একটি ছোট শহর। তাই সেখানে খুব একটা লোকসমাগম নেই। ক্যাম্পাস বন্ধ। আমাদের মতোই তারাও অনলাইন ক্লাস করে। জুম অ্যাপটি ব্যবহার করে। ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে নেই। জানাল যে ক্যাম্পাসে তারা কারো সঙ্গে দেখা হলে দূর থেকেই হাত তোলে স্বাগত জানায়। ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না। কথা বলতে হলে ফোনে কথা বলে। যদিও তার সহকর্মীটি হয়তোবা পাশের কক্ষেই বসে আছে। ক্যাম্পাস খোলার কি লক্ষণ আছে? জানাল ছাত্রছাত্রীদের ভিসা সমস্যা সমাধানের জন্য তারা ক্যাম্পাসে ক্লাসের ব্যবস্থা নিচ্ছে। নচেৎ অনেকেরই যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ভিসা রইবে না। কীভাবে করবে? প্রথমত, আমরা প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মচারীদের প্রতি দুদিন অন্তর করে কভিড টেস্ট করাচ্ছি। দেখছি ক্যাম্পাসে কভিড রোগী রয়েছে কিনা। আমাদের পলিসি হলো, ক্যাম্পাসে কভিড পজিটিভ শূন্য হলে তবেই ক্যাম্পাস খুলবে। এখন পর্যন্ত তা হয়নি। সর্বশেষ দুজনকে পাওয়া গেছে। তবে ক্যাম্পাসে নতুন প্রোটোকল ঘোষণা হয়েছে। কী রকম? ক্যাম্পাসে আসা না-আসাটা ছাত্রদের নিজস্ব ব্যাপার। কারণ তাদের কভিড হলে বিপদ। দ্বিতীয়ত, বিভাগভেদে সপ্তাহে অন্তত একটি ক্লাস ক্যাম্পাসে নেয়ার চেষ্টা হবে। তাও হবে সীমিতসংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতিতে। কারণ শিক্ষার্থীরা একত্রে হলেই জটলা করবে। তখন সারা ক্যাম্পাসে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটাই বিপদ। আবার যারা হোস্টেলে থাকবে তাদের প্রত্যেককে আলাদা রুমে রাখার চেষ্টা চলছে। ভাগাভাগি করে থাকার ব্যবস্থা থাকছে না। ভাগাভাগি বলতে বাথরুম, কিচেন ভাগাভাগি বোঝাচ্ছে। অতঃপর? আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু সবাই চিন্তিত। কারণ হোস্টেলে কেউ অসুস্থ হলে কী করে আলাদা রাখা হবে? কী করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে? এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ভারতের বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কী অবস্থা? আমাদের প্রথমে কোনো চিন্তা ছিল না। আমরা ক্যাম্পাসে যেতাম। তবে ক্লাস চলত অনলাইনে। আমরা ব্যবহার করি গুগলের মিট অ্যাপটি। তবে এতদিন আমরা প্রতিদিনই অফিসে যেতাম। তবে এখন অবস্থা খারাপ। বাসায়ই রয়েছি। নেপালের কী অবস্থা? আমরা তো রয়েছি কারফিউর মাঝে। মানে? মানে সকাল ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা, তবে হাঁটাপথ ছাড়া কেউ বের হতে পারছে না। বাকি সময় কারফিউ। সবকিছু চলছে বাড়ি থেকে।

বুঝতেই পারছেন সারা পৃথিবীতে অবস্থা নিয়ন্ত্রণহীন। কী করা যায়, তা নিয়ে যতই অংক কষি না কেন, কী করা যায় তা নিয়ে সবাই চিন্তিত। এরই মাঝে আমার এক ভাগনি জানাল, তাদের স্কুল ক্লাস নাইনের ছাত্রদের ডেকেছে। কী কারণ? ক্লাস নাইনে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বোর্ডের ফরম পূরণ করতে হবে। কী কাণ্ড! বোর্ড কি অনলাইনে ফরম দিতে পারেনি? কী জানি, তবে স্কুল জানিয়েছে যেতে। ক্লাস নাইনের ছাত্ররা যাবে। আচ্ছা! কিছুটা অবাক, কিছুটা চিন্তিত সবাই। কিন্তু কী করা যায়। হেডমাস্টার মনে করেন তার ছাত্রদের ফরম স্বহস্তে পূরণ করতে হলে স্কুলেই যেতে হবে। সবাই কি ঢাকায় আছে? না তা নয়। তবে? যারা ঢাকার বাইরে রয়েছে, তারাও আসবে ফরম পূরণ করতে।

কয়েক দিন বাদে খবর পাওয়া গেল, ফরম পূরণ করতে মোট দুদিন যেতে হয়েছে স্কুলে। এই দুদিন তারা প্রচুর আনন্দ করেছে। বহুদিন পর বন্ধুদের পেয়েছে। তবে তার এখন জ্বর! কী বলো? মা-বাবার মাথায় বাড়ি! বাবার অফিস বন্ধ। মায়ের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। একঘরে মেয়েকে কী করে আলাদা রাখা যায়? বাথরুমও আলাদা করতে হবে। এদিকে বাবার অফিসে প্রচুর কাজ। কিন্তু তাকেও থাকতে হবে আইসোলেশনে! কভিড টেস্ট করিয়েছ? না করাইনি, তবে হয়েছে। কী করে বুঝলে? জানাল ওর পাঁচ বান্ধবী দুদিন একসঙ্গেই ছিল। একজন এসেছে খুলনা থেকে। সে খুলনা যাওয়ার পথে বাসেই তার জ্বর এসেছে। পরীক্ষায় কভিড ধরা পড়েছে। অন্য আরো দুজনও জ্বরে ভুগছে। তারা পরীক্ষা করিয়েছে। তাদেরও নাকি কভিড পজিটিভ। বাকি রয়েছিল আমার ভাগনি ও অন্য একজন। ওরও জ্বর। সব লক্ষণই রয়েছে। তাই কভিড নয়তো কী? বললাম, পরীক্ষা করিয়ে নাও। বাসায় এসেও পরীক্ষা করা যায়। কী হবে পরীক্ষা করে। রোগ তো বোঝাই যাচ্ছে। তবুও! কয়েক দিন পর জানা গেল মায়েরও জ্বর। কী করা! রিলিফ অপারেশনে নামতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন। একজনের অসুস্থতা আমাদের সমাজে কতজনকে ব্যস্ত করে তোলে! বললাম, তোমাদের বাসার পাশেই তো হাসপাতাল। যাও পরীক্ষা করাও। সম্ভব নয়! কী কারণ? ওখানে গেলে কভিড না হলেও লাইনে দাঁড়িয়েই নাকি কভিড হবে! আচ্ছা, তবে বাসায়ই করিয়ে নাও।

বাসায় করোনা পরীক্ষার ফি শুনে আক্কেলগুড়ুম। প্রতিজনের জন্য ৪ হাজার ৫০০ টাকা। বাসায় চারজনের জন্য ভনতে হবে ১৮ হাজার টাকা! তার চেয়ে বুঝে-শুনে ওষুধ খাই! বোনের সঙ্গে কথা বললাম। আমি তো ওষুধ খাওয়া শুরু করে ফেলেছি! টেস্ট না করেই? শোনো, যত তাড়াতাড়ি ওষুধ ধরবে ততই ভালো। নচেৎ হাসপাতালে যেতে হবে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে। তখন বাঁচার সম্ভাবনাই নেই। কী ওষুধ? আমার কাছে লিস্ট করা আছে। ঘটনাটা বলছি কারণ অপরিণামদর্শী শিক্ষা বোর্ড কিংবা প্রধান শিক্ষককে কী বলা যায় বলুন? আমাদের দেশে একজন অসুস্থ হলে কত জনের সাহায্য প্রয়োজন ভেবেছেন কি? এই তুলনায় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেয়া যায়। তাদের জ্ঞান বোর্ডের হর্তাকর্তাদের চেয়ে বেশি। তারা দুজনই বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি হয় এমন কাজ আমরা করব না। সবকিছু না বুঝে আমরা শিক্ষাঙ্গন খুলছি না। কিন্তু স্কুলটির প্রধানশিক্ষক বা ঢাকা বোর্ডের জ্ঞানে তা ধরেনি! তাই দেখবেন এসব সরকারি কর্মচারীর চেয়ে আমাদের রাজনীতিকরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। অনেক বেশি জনদরদি।

এর মধ্যেই বরিস জনসন সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করলেন, লন্ডনে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছিল কিন্তু শিক্ষার্থীরা দূরত্ব পালন করেনি। রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। তাদের আবার বাড়তি চিন্তা। শিক্ষার্থীরা হোস্টেল থেকে বাসায় গেলে বাসায় তা ছড়াবে। তাই তার অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। বুঝতেই পারছেন। অবস্থা কেমন। তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করলেন, বাবারা মাস্ক পরো আর দূরত্ব বজায় রাখো। আমার মনে পড়ে গেল ভাগনিটির কথা। অসম্ভব ব্যাপার। শিশু-কিশোরদের দূরত্ব বজায় রাখার চিন্তা কি সম্ভব?

কথা হচ্ছিল ব্যাংককের এআইটির এক অধ্যাপকের সঙ্গে। তিনি জানালেন, থাইল্যান্ড করোনাকে সামলে নিয়েছে। সেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে। সেখানে দিনে ১০ জনের নিচে রোগী ধরা পড়ছে গত মে মাস থেকে। তাই তারা খুলছে। তবে তাদের ইনস্টিটিউটে বিদেশী ছাত্ররা এখনো অনলাইনে ক্লাস করছে। থাই ছাত্ররা ক্লাসরুমে আসছে। তবে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে তৈরি করেছে পৃথক আবাসস্থল। যেখানে করোনা রোগী ধরা পড়লে থাকবে। সবই করতে হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে।

আমার সহধর্মিণীও শিক্ষক। তিনিও নিয়মিত জুমে ক্লাস নিচ্ছেন। তার ছাত্রদের বয়স চার-পাঁচ বছর হবে। বললাম, কী করে তোমরা অনলাইনে পড়াও? ওরা কি জানে কী করে কলম ধরতে হবে? ওদেরকে কলম ধরানোও শেখাতে হয়। হুম। সহজ না। কিন্তু মায়েরা পাশেই থাকে। তাদের সাহায্য করতে হয়। বুঝলাম কিন্তু যে মায়ের দুটি সন্তান দুটি ক্লাসে পড়ে? কিংবা যে বাসায় তিনটি ছাত্র, একসঙ্গে ক্লাসে অনলাইনে বসে কী করে? উত্তর নেই। কিংবা যদি মা-বাবা শিক্ষিত নন, তাদের অবস্থা কী? আমরা চেষ্টা করি বুঝিয়ে দিতে। আর কী করা যাবে। তবে মায়েরা বহু কষ্ট করছে। তারাও পড়ছে। সন্তানদের সঙ্গে। তবে আমরা চেষ্টা করি ক্লাসের সময় কমিয়ে দিতে। কারণ মোবাইল সবার নেই। সবাই একসঙ্গে পড়তে গেলে নীরব কক্ষ ঘরে থাকবে না। আবার সবাই ভিডিও ক্লাস করতে না-ও চাইতে পারে। কারণ বাসার অবস্থা বাকি সবাইকে জানান দেয়ার ইচ্ছা অনেকের নেই।

বুঝতেই পারছেন। সারা বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা পার করছে একটি কঠিন সময়। এর মধ্যে দেখলাম আমাদের কোনো কোনো সহকর্মী অনলাইন পরীক্ষায় নকল নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। ছাত্রছাত্রীদের ক্যামেরা খুলে রাখতে বলছেন। অনেকেই তা করতে চায় না। অনেকেই বাসায় আত্মীয়পরিজন নিয়ে বাস করে। সবাই কাজে ব্যস্ত। এ সময় ক্যামেরা অন করে ক্লাস করা বাধ্যতামূলক করাকে অনেকেই পছন্দ করে না। কারণ সবাই হয়তো ক্যামেরায় চেহারা দেখানোর অবস্থায় থাকে না। এক সহকর্মী তো বলেই বসলেন, কেন ওরা ক্যামেরা খুলে রাখতে পারবে না? কেন জিআরই পরীক্ষার সময় তো পারে! কী বলা যায় তাকে? আমাদের সব শিক্ষক শিক্ষকের যোগ্যতা যে রাখেন না, সব প্রধান শিক্ষক যে প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ত নন, তারই প্রমাণ এসব ঘটনা। শিক্ষকতা কোনো চাকরি নয়, এটা যে একটি ব্রত, তা অনেকেই না বুঝে চাকরি করতে এসেছেন। তাদের নিয়েই যত বিপদ

মুদ্রার ওপিঠ রয়েছে। আমার এক ছাত্রী। তার তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে বিপদে রয়েছে বলে জানাল। বলল, বয়স তিন তাই ওর সমবয়সীদের সঙ্গে না মিশলে হচ্ছে না। বাসায় থেকে যন্ত্রণা করছে। ছটফট করছে ঘরে বসে। কী করা যায় বুঝতে পারছি না। বললাম স্কুলে দিলেও বিপদ হতে পারে। শিশুদের অধিকাংশেরই কভিড উপসর্গ কম দেখা যায়। তারা সহজে কাশতেও পারে না। তাই তাদের কভিড হলে বিপদ বেশি। তাই সাবধান থাকতে হবে। স্কুল খুলে গেলে দেখবে এক শিশু তা ছড়াচ্ছে অন্য শিশুকে আর তা থেকে ছড়াবে বাসায় বাসায়। বাংলাদেশ উন্নত বিশ্ব নয় যে শিশুকে হাসপাতালে রেখে মা-বাবারা কাজে যেতে পারবেন। তখন শিশুসহ পরিবারের সবাই হয় অসুস্থ হবে নচেৎ চিকিৎসা-পরিচর্যায় ব্যস্ত হবে। কী পরিমাণ বিপদ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না।

মোদ্দাকথা, করোনায় সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় হবে শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায়। সব ক্ষেত্রে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অনলাইন কার্যক্রমকে তৈরি করতে হবে শিক্ষকতার ব্রত দিয়ে। ব্যবস্থা হতে হবে মানবিক। প্রয়োজন পড়বে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। আশা করি সবাই ভাবছেন।

ড. এ. কে. এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট

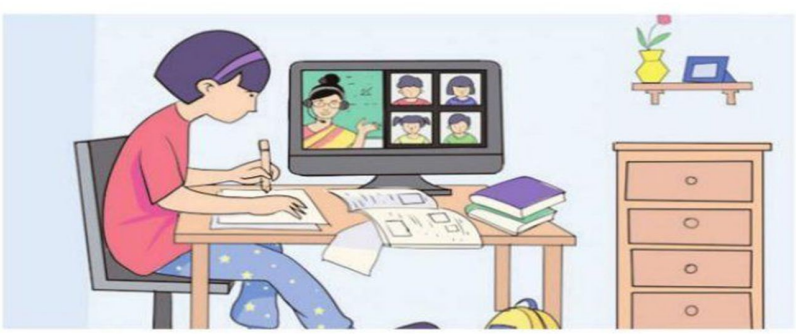

সারা বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা পার করছে একটি কঠিন সময়। এর মধ্যে দেখলাম আমাদের কোনো কোনো সহকর্মী অনলাইন পরীক্ষায় নকল নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। ছাত্রছাত্রীদের ক্যামেরা খুলে রাখতে বলছেন। অনেকেই তা করতে চায় না। অনেকেই বাসায় আত্মীয়পরিজন নিয়ে বাস করে। সবাই কাজে ব্যস্ত। এ সময় ক্যামেরা অন করে ক্লাস করা বাধ্যতামূলক করাকে অনেকেই পছন্দ করে না। কারণ সবাই হয়তো ক্যামেরায় চেহারা দেখানোর অবস্থায় থাকে না। এক সহকর্মী তো বলেই বসলেন, কেন ওরা ক্যামেরা খুলে রাখতে পারবে না? কেন জিআরই পরীক্ষার সময় তো পারে! কী বলা যায় তাকে? আমাদের সব শিক্ষক শিক্ষকের যোগ্যতা যে রাখেন না, সব প্রধান শিক্ষক যে প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ত নন, তারই প্রমাণ এসব ঘটনা। শিক্ষকতা কোনো চাকরি নয়, এটা যে একটি ব্রত, তা অনেকেই না বুঝে চাকরি করতে এসেছেন। তাদের নিয়েই যত বিপদ